সূচীপত্র

বাংলাদেশে মুসলিম পরিচয়:

আমাদের মুখ্য পরিচয় আগে হলো আমরা মুসলিম। কিন্তু এই যে আমাদের পরিচয়, এই সমাজ ও রাষ্ট্রে সেটার অবস্থান কী? এই পরিচয় সমাজে কি শক্তিশালী নাকি দুর্বল?

দেখেন, আপনি যখন সমাজে আপনার পেশাগত পরিচয় নিয়ে হাজির হন, বা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ে হাজির হন, পারিবারিক পরিচয়ে হাজির হন তখন হয়তো আপনার সম্মান আছে। আমি যখন আমার শিক্ষা, বংশীয় পরিচয়, পারিবারিক পরিচয়, ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা সোশ্যাল স্ট্যাটাস নিয়ে সমাজে হাজির হন তখন আমি শক্তিশালী। কিন্তু আমি যখন ইসলামকে আমার মূল পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করে জনপরিসরে আসছি, যখন আমি মুসলিম হিসেবে সমাজে হাজির হচ্ছি, তখন আপনি দুর্বল।

এর অনেক উদাহরণ আছে

মোদি বিরোধী আন্দোলন:

২০২১ সালে মোদী বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল আপনারা জানেন। ঐ আন্দোলনে মানুষ মারা গিয়েছিল। কত মানুষ মারা গিয়েছিল কেউ বলতে পারবেন? এটলিস্ট ১৭ জন মানুষ মারা গিয়েছিল। এটার কোন বিচার হয়েছে? হয়নি। এটা নিয়ে কোনো কথা হয়েছে? হয়নি। এখনো কোনো কথা হচ্ছে? হয়নি।

এরপর দেখেন মানুষ তো মারা গেল, আল্লাহ তাদেরকে কবুল করেন শহীদ হিসেবে। তারপরে আলেম-উলামাদেরকে ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা হলো। শুধু গ্রেপ্তার করা হলো না তাদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর সব মিথ্যা অভিযোগ আনা হলো।

মাওলানা মামুনুল হক:

আপনারা জানেন মাওলানা মামুনুল হক হাফিজাহুল্লাহ- তাঁর বিরুদ্ধে প্রচন্ড মিথ্যা অভিযোগ আনা হলো, টার্গেট করে তাঁকে হয়রানী করা হলো। এই সময় আমাদের যে সমাজ, তাদের রিয়েকশন কী ছিল? সেক্যুলার সমাজের জায়গা থেকেও একটা বেসিক, নূন্যতম সভ্যতা, ন্যূনতম ভব্যতা দরকার ছিল। সেটা ছিল কিনা? না, সেটা ছিল না।

মুফতি কাজী ইব্রাহীম

কাছাকাছি সময় দেখেন মুফতি কাজী ইব্রাহীম হাফিজাহুল্লাহ, তাকে গ্রেফতার করা হলো। তাকে যখন গ্রেপ্তার করা হলো, আপনারা দেখেছেন কিনা জানিনা, খবরে নিউজ করা হল যে "কথিত বক্তা"। একটা মানুষ যার বক্তব্য এ দেশের লক্ষ লক্ষ বা কোটি মানুষ শোনে, একজন আলেমে দ্বীন, তাকে বলা হচ্ছে "কথিত বক্তা"। কলমের একটা খোচায় তিনি হয়ে গেছেন কথিত বক্তা। এটা হল এই সমাজের অবস্থা।

দেলোয়ার হোসেন সাইদী:

মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী সাহেব রাহিমাহুল্লাহ, দেখেন তাঁর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হয়েছে। ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে। চিন্তা করেন আপনারা।

আমি যাদের কথা বললাম তারা বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরাম। আপনার তাদের সাথে দ্বিমত থাকতে পারে সেটা বিষয় না, বিষয়টা হলো তাদের যে সামাজিক অবস্থান আছে, তাদের যে দ্বীনি অঙ্গনে অবস্থান আছে এটা তো আপনাকে স্বীকার করতে হবে। ওলামায়ে কেরাম হলেন দ্বীনি সমাজের মুরব্বী, কিংবা ইন জেনারেল সমাজের মুরব্বী। মানুষ যখন দ্বীনের কথা চিন্তা করে, তখন তারা ওলামায়ে কেরামের কথা চিন্তা করে। তাদের অবস্থান এটা। ন্যূনতম বেসিক জাস্টিস, ইনসাফ, সম্মান, ভদ্রতা, আপনি দেখেন তারা পাচ্ছেন না। আপনার কী অবস্থা? আপনি কে? তাদের যদি এই অবস্থা হয় আপনার কী অবস্থা? এটা হল বাস্তবতা।

শাপলা চত্বর

শাপলা চত্বরের ঘটনা চিন্তা করেন, ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে যে ঘটনাটা ঘটলো। মানুষ কেন এসেছিল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবমাননা হয়েছে, ওলামায়ে কেরাম ডাক দিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবেসে আসলেন, তখন তাদের সাথে কী আচরণ করা হলো? একটা দেশের রাজধানীতে, মতিঝিলের মত একটা জায়গায়, রাতের বেলায় লাইট নিভিয়ে ক্লিয়ারিং অপারেশন করা হলো। ১ লক্ষ ৫৫ হাজার রাউন্ডের বেশি বুলেটস এবং টিয়ারশেল ব্যবহার করা হলো। বলা হলো যে এরা তান্ডবকরী। এটা হল সমাজে আপনার অবস্থা।

কিছুদিন আগে ২০২২ সালের ১০ই ডিসেম্বর, সম্ভবত বিএনপির একটা জনসভা হয়েছিল। ঢাকাতে, গোলাপবাগে। এটা ইনিশিয়ালি পল্টনে হওয়ার কথা ছিল, পরে গোলাপবাগে হয়েছিল। সন্ধ্যা থেকে মানুষ সেখানে জড়ো হওয়া শুরু হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানেই রাত কাটিয়েছে। তখন অনেকের মধ্যে একটা আশঙ্কা ছিল হয়তো এখানেও হয়তোবা ক্র্যাকডাউন হবে। শাপলার মত ঘটনা এখানেও হবে। তখন অনেকেই এমন কথা বলছিল। তখন একজন সাংবাদিক, আপনারা চিনবেন নাম বললে, বিদেশে থাকেন, উনি একটা স্ট্যাটাস লিখেছিলেন ফেসবুকে। আমার এখনো মনে আছে। উনি বলেছেন, শাপলা চত্বরে হেফাজতের সমাবেশে ক্র্যাক ডাউন করা আর গোলাপবাগে বিএনপির সমাবেশে ক্র্যাক ডাউন করা, এটার মধ্যে পার্থক্য আছে।

এটার মানে কি? মানে হলো, হেফাজতের উপরে যত ইজিলি (সহজে) ক্র্যাক ডাউন করা যায়, বিএনপির উপরে অত ইজিলি ক্র্যাকডাউন করা যায় না। এটা বাস্তবতা আসলে। নিরাপদ সড়ক আন্দোলন হয়েছিল ২০১৮ সালে, ওটা কিন্তু ব্যাপক তীব্র আন্দোলন হয়ে উঠেছিল একসময়। কিন্তু ওই সময়ও ইভেন হাসিনা সরকারও এটা চিন্তা করেনি যে, হেফাজতকে যেভাবে দমন করেছি ছাত্রদেরকেও সেভাবে দমন করি। এটা কিন্তু সে চিন্তা করেনি, কেন? কারণ আপনি যদি মুসলিম পরিচয় নিয়ে আসেন, আপনি যদি ইসলামের পরিচয় নিয়ে আসেন, তখন আপনাকে যেভাবে দমন করা যায়, আপনার উপর যেভাবে শক্তি প্রয়োগ করা যায়, এটা অন্যদের ক্ষেত্রে করা যায় না। এটা বাস্তবতা।

জুলাই আন্দোলনে মাদ্রাসা ছাত্র:

আরো একটা এক্সাম্পল (উদাহরণ) দেখেন, জুলাই আন্দোলনে মাদ্রাসার ছাত্রদের অংশগ্রহণ কেমন ছিল? এটা নিয়ে আমরা একটা সার্ভে করার চেষ্টা করেছিলাম। সেই সার্ভে করতে যেয়ে আমরা যেটা দেখলাম, খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, যাত্রাবাড়ী, এটা কিন্তু সেসময়ে আন্দোলনের একটা কি-পয়েন্ট, সবচেয়ে তীব্র, ইন্টেন্স আন্দোলন এখানে হয়েছে, এখানে ম্যাসাকার হয়েছে, এবং আন্দোলন প্রতিরোধ-দমন অনেক বেশি হয়েছে আপনারা জানেন। ওইখানে যাত্রাবাড়ীতে যে বিভিন্ন মাদ্রাসা ছিল, সে মাদ্রাসার স্টুডেন্টরা কিন্তু সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। শুধু করে নাই, তারা ইনফ্যাক্ট ১৭ তারিখ থেকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছিল। কিন্তু তারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে প্যান্ট শার্ট পড়ে। তারা টুপি পড়ে নামেনি, তারা পায়জামা পাঞ্জাবি জুব্বা পরে নামেনি, কেন? আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কেন? তাদের কথা ছিল, " আমরা যদি ওইভাবে নামি, আমাদের উপর গুলি বেশি চলবে। আর আমরা যদি ওই পোশাকে মারা যাই, আমাদের নিয়ে কথা কম হবে।" এটাই হল সমাজের বাস্তবতা। তারা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে নামতে পারেনি।

এরকম শত শত উদাহরণ আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারব। আপনি বলতে পারেন, এটা বলে আনন্দ পেতে পারেন যে, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশ, আমরা ৯০% মুসলিমের দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে পারেন।

কিন্তু এই সমাজে আপনি সেকেন্ড ক্লাস সিটিযেন। যদি আপনি প্রকৃতভাবে ইসলামকে আকড়ে ধরে, পূর্ণাঙ্গভাবে মুসলিম পরিচয়কে আকড়ে ধরেন, তাহলে আপনি সেকেন্ড ক্লাস সিটিযেন।

রাষ্ট্র, সমাজ এবং সংস্কৃতি আপনার প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং তারা আপনাকে দমন করে।

সমাধান কিভাবে? বিদ্যমান অ্যাপ্রোচ:

এ বিষয়গুলো আসলে নতুন কিছু না, আমরা যে এখানে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন, আমাদের অবস্থান যে দুর্বল, এটা আমরা মোটামুটি বুঝি। হয়তো আমরা এভাবে আর্টিকুলেট করি না, কিন্তু এই অনুভূতিটা, উপলব্ধিটা আমাদের মধ্যে আছে। আপনার দেখবেন যে, আজ থেকে ৩০-৪০ বছর আগে, মাওলানা আব্দুর রহিম রহিমাহুল্লাহ উনার একটা বক্তব্য ছিল, সেটা পুস্তিকা আকারে পরবর্তীতে বের হয়েছে, সেটার নাম ছিল "বাংলাদেশের মুসলিমরা মাজলুম এবং মাহরুম", অর্থাৎ এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমাদের মধ্যে ছিলো। এটা শুধু উনি না, আরো অনেকেই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তো এই যে সমস্যা এটার মুখোমুখি হয়ে আমরা কী করি? এটার মুখোমুখি হয়ে আমরা মোটা দাগে তিনটা অ্যাপ্রচ গ্রহণ করেছি।

- একটা হল অ্যাসিমিলেশন, অর্থাৎ মিশে যাওয়া, যে আমরা সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছি, আর খাপ খাওয়াতে গিয়ে ইসলামের জায়গায় ছাড় দিয়েছি। সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ইসলামের জায়গায় ছাড় দিয়েছি, আপোষ করেছি। এটা হল একটা এপ্রোচ, এসিমিলেশন, অর্থাৎ মিশে যাওয়া, মিশ্রণ।
- দ্বিতীয় এপ্রোচ, আইসোলেশন, বা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, আলাদা হয়ে থাকা। আমরা নিজেদের একটা বলয় বানিয়ে নিয়েছি। সেটা হতে পারে আমার নিজের কমিউনিটি, আমার ভাই ব্রাদারদের একটা কমিউনিটি, বা মসজিদ বা মাদ্রাসা বা খানকাহ, এটাকে নিয়ে একটা এলাকা আমরা আলাদা করে ফেলেছি, বা একটা অঙ্গন এবার একটা বর্ডার আমরা আলাদা করে নিয়েছি, এটার মধ্যেই আমরা মূলত থাকি, এর বাইরে যাওয়াটা আমরা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। একান্ত প্রয়োজন হলে, হয়তোবা আমরা ওটার বাইরে কিছুটা আসি, কিন্তু আমরা বেশিক্ষণ থাকতে চাই না, আমরা চাই আমরা চাই আমাদের ওই বলয়ের মধ্যে ফেরত যাওয়ার। এটা হলো দ্বিতীয় এপ্রোচ। আইসোলেশন বা আলাদা হয়ে যাওয়া।
- তৃতীয় অ্যাপ্রোচ, রিজেকশনিজম। এটা তরুণদের মধ্যে একটু বেশি আছে। সেটা হলো "এই সমাজটা জাহিলিয়াতের সমাজ, আমি এখানে থাকবো না, আমি এখান থেকে চলে যাব, অথবা হয়তো কখনো এখানে কিছু একটা হবে, তখন আমি সেটা করব, এরকম একটা চিন্তা। কিন্তু এর আগ পর্যন্ত সমাজ থেকে দূরে দূরে থাকবো, আমি সমাজের সাথে মিশবো না, আমি আমার মতো থাকবো" ইত্যাদি।

বিদ্যমান তিন অ্যাপ্রোচের দুর্বলতা:

মোটা দাগে আমার কাছে মনে হয়েছে এই তিনটা অ্যাপ্রোচ আমাদের আছে। সমাজের সাথে মিশে যাওয়া, নিজেদের একটা আলাদা বলয় বানানো, সেখানে থাকা, অথবা সমাজকে প্রত্যাখ্যান করা, সুযোগ আসলে চলে যাব, সুযোগ আসলে কিছু করব, এরকম চিন্তা নিয়ে থাকা, কিন্তু এই তিনটা অ্যাপ্রচের কোনটাই দীর্ঘ মেয়াদে আসলে কার্যকরী না। কেন না?

- যদি আপনি মিশে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে আল্টিমেটলি কী হবে? তাহলে আল্টিমেটলি মিশতে মিশতে ইসলামটা আর থাকবে না, এর পুরোটাই জাহিলিয়াতটা থাকবে, অথবা পুরো সেকুলারিজম টা থাকবে, এর বাইরে আর কিছু থাকবে না। এটা হলো একটা সমস্যা।
- আইসোলেশনিজম বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের একটা অঙ্গন নিয়ে থাকবেন, এটাও দীর্ঘমেয়াদে টেকসই না, কেন? দুটো কারণে,
    - এক নম্বর কারণ হলো, সেক্যুলার রাষ্ট্র আপনার যে বলয় আছে এটাকে ক্রমাগত ছোট করবে। সেটাকে সে এভাবে থাকতে দিবে না, এটাকে সে আস্তে আস্তে ছোটো করে নিয়ে আসবে এবং সে হস্তক্ষেপ করবে। "মাদরাসায় জাতীয় সংগীত গাও", এই ধরণের কথাবার্তা সে বলবে। সে এসে

হস্তক্ষেপ করে বলবে, “তোমার মসজিদে খুতবাহ কী হবে সেটা কিন্তু আমি ঠিক করে দিব” এভাবে নানাভাবে সে আপনাকে হস্তক্ষেপ করবে, আপনার জায়গাটাকে ছোটো করে আনার চেষ্টা করবে।

- এটার আরেকটা প্রবলেম হলো, সমাজে আপনার অবস্থান দুর্বল হবে। কেন? কারণ সমাজের মানুষ দেখবে যে আপনি তার দৈনন্দিন যে সমস্যাগুলো, তার আর্থ-সামাজিক যে সমস্যা, তার পেরেশানিগুলো নিয়ে আপনার কোনো মন্তব্য সেভাবে নাই। দ্বীনি বিষয়ে সে আপনার কাছে আসবে, আপনাকে সে সম্মান করবে, তার ইসলাহের জন্য সে আপনার কাছে আসবে বা আপনাদের কাছে আসবে, কিন্তু, তার নিজের দুনিয়াবী যে সমস্যা, সেটার জন্য সে কার কাছে যাবে?

  সেটার জন্য সে যাবে সেকুলারদের কাছে, তো এটাতে আপনার অবস্থানটা কী হবে আল্টিমেটলি?? শক্তিশালী হবে নাকি দুর্বল হবে? ডেফিনেটলি দুর্বল হবে।

- আর রিজেকশনের যে এপ্রোচ, এটা আসলে ভায়াবল না, কারণ আপনি তো সমাজকে পুরোপুরি আল্টিমেটলি প্রত্যাখ্যান করতে পারছেন না। আপনার বয়স বাড়ছে, আপনি সমাজের মধ্যেই আছেন, আপনার বয়স বাড়ছে, আপনার দায়িত্ব বাড়ছে, আপনার সন্তান-সন্ততি হচ্ছে, আপনি কিন্তু আসলে কোনো পরিবর্তনের জন্য কাজও করতেসেন না, কোন মিনিংফুল কাজ করতে পারছেন না।
  - অন্যদিকে, আপনি কোথাও চলে যাবেন এটা যদি কেউ করতেও পারে এক দুইজন পারবে, লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য এটাতো অপশন হতে পারেনা, তারা কোথায় যাবে আসলে? কিভাবে যাবে? এটা একটা বিষয়।
  - আরেকটা বিষয় হলো, কখনো সুযোগ আসলে কিছু একটা করব, এই যে চিন্তাটা, আপনি সুযোগ আসলে কিছু করতে পারবেন না, কারণ আপনার প্রস্তুতি নেই, দূরে থেকে কিছু হবে না যে হঠাৎ করে কিছু একটা আসলো আর আপনি চলে যাবেন, যেমন আল মাহদী এসেছে আমি তার বাহিনীতে যোগ দিলাম, ব্যাপারটা তো সোজা না, কারণ আল মাহাদীর বাহিনীতে যারা যোগ দিতে পারবে তাদের একটা বিশাল পরিশুদ্ধির প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, আপনি ফট করে গিয়ে আল মাহদীর বাহিনীতে কাজ করতে গিয়েছেন, “প্রেজেন্ট স্যার, চলে এসেছি”, ব্যাপারটা এরকম না।

***

সুতরাং সমস্যা হল যে তিনটা অ্যাপ্রচ আছে, আমি মনে করি এই তিনটা অ্যাপ্রচের কোনোটাই আসলে ভায়াবল না, টেকসই না। আমি বলছি না যে এগুলোর মাধ্যমে কোন ভাল কাজ হয় না। আমি বলছি এগুলো ভায়াবল না, টেকসই না। যদি এরকমই থাকে, বর্তমান অবস্থাই চলমান থাকে, তাহলে সামনে অবস্থা ভালো হবে না খারাপ হবে? দিন দিন অবনতি হতে থাকবে। এবং আমাদের সামনে বিভিন্ন রকমের সংকট আছে, আমরা অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে পড়বো, আমি মনে করি।

অস্তিত্ব সংকট মানে কী? অস্তিত্ব সংকট মানে হল, আপনি ঈমান নিয়ে সংকটে পড়বেন, আপনার বাড়ি থাকবে গাড়ি থাকবে টাকা পয়সা থাকবে ফ্যামিলি থাকবে সবকিছু থাকবে, কিন্তু সমাজে ঈমানের জায়গাটা ক্রমশ দুর্বল হতে থাকবে। কারণ ফাহেশা যেটা, জাহেলিয়াত যেটা, আপনি অপসংস্কৃতির প্রভাব বলেন, যে বিষয়টাই বলেন না কেন, আল্টিমেটলি ক্রমাগত বাড়বে। এই সিস্টেমের মধ্যে এটা ক্রমাগত বাড়বে, কমবে না। আর আপনার অবস্থান ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকবে। এটার রেজাল্ট কি? অংক মিলান। সহজ অংক মিলান। এটার অবস্থা হলো, আপনি ইমানের সংকটে পড়বেন। এটা বাস্তবতা।

পাশাপাশি একটা প্রশ্ন আমাদের করা উচিত যে, আমরা কি আসলে এরকম সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে থাকব কিনা সবসময়? আপনি কি জিল্লতির জীবন নিয়ে থাকবেন? আপনি মাথা নিচু করে থাকবেন সব সময়? একজন মুসলিমের জীবন তো এরকম হওয়ার কথা না, আমরা কিন্তু আল্টিমেটলি এটার মধ্যে বর্তমানে আছি, বর্তমানটা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, তো এই সংকটের মোকাবেলা করার জন্য আমি মনে করি আমাদের নতুন বা বিকল্প পথ চিন্তা করা আমাদের দরকার, এই তিনটা যে পথ বললাম এর বিকল্প পথ দরকার।

বিকল্প:

বিকল্প পথ কি হতে পারে এখানে আমার প্রস্তাবনা হলো, ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে সমাজকে পরিবর্তনের চেষ্টা করা. এটা আমি এক লাইনে বলছি, এখন ব্যাখ্যা করছি।

- প্রথম কথা হল আপনি সমাজের সাথে মিশে যাবেন না, আপনি সমাজকে বদলানোর চেষ্টা করবেন, তার মানে হল সমাজে প্রচলিত যে মূল্যবোধ আছে, ন্যারেটিভ আছে, সেগুলোকে চ্যালেঞ্জ করবেন। এবং সেকুলার প্রগতিশীল, যাদের কালচারাল হেজেমনি আছে, যারা সমাজের বয়ান নিয়ন্ত্রণ করে, যারা সমাজের চিন্তা গুলো নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের বক্তব্যগুলো, তাদের চিন্তাটা সেগুলো আপনি খন্ডন করবেন, অ্যাটাক করবেন, বা ভাঙবেন, এবং আপনি আদর্শিক লড়াই করবেন ইসলামের জায়গা থেকে।
- দ্বিতীয় যে বিষয়টা, সেটা হল আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবেন না, আপনি সমাজের সাথে এনগেজমেন্ট করবেন, সবার সাথে মিশবেন, কিভাবে মিশবেন? সমাজের মুনকারের বিরুদ্ধে আপনি অবস্থান নিবেন। সমাজের মানুষের সমস্যাগুলোর ইসলামী সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং আপনি ইসলামকে একটা ভায়াবল সল্যুশন হিসেবে তার সামনে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করবেন।
- আপনি জাহিলিয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবেন, এবং মানুষকে পূর্ণাঙ্গ একটা দ্বীনের দিকে আহবান করবেন। এটা শুধুমাত্র মুখে প্রত্যাখ্যান না, আপনি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন এবং মানুষকে বলবেন আপনারা জাহেলিয়াত ছেড়ে ইসলামের দিকে আসেন। এটা হল বাংলা কথা। আমি একটু পরে আরো ব্যাখ্যা করছি।

নবীদের (আলাইহিমুসসালাম) দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য:

দেখেন, নবীদের যে দাওয়াহ, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম তাদের দাওয়াহর মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল,

- কুফর বিত তাগুত ওয়া ইমান বিল্লাহ, সকল মিথ্যা ইলাহকে অস্বীকার করা, সকল মিথ্যা দ্বীনকে অস্বীকার করা, নাফী করা, তারপর তাওহীদকে সত্যায়ন করা, তাওহীদের সাক্ষ্য দেওয়া।
- আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার। তারা সমাজের মুনকারের বিরুদ্ধে বলেছেন বা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সামর্থ্য থাকলে , আর তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করেছেন বা সৎকাজের দিকে ডেকেছেন।
- আল ওয়ালা ওয়াল বারা। আল্লাহ যে জিনিসটাকে ভালোবাসেন সেটাকে আমি ভালোবাসবো, আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন আমি তাদেরকে ভালোবাসবো, আর আল্লাহ যে জিনিসটা অপছন্দ করেন বা ঘৃণা করেন, যাদেরকে অপছন্দ করেন বা ঘৃণা করেন, সে জিনিসগুলোকে, সেই বিষয়গুলোকে, আমি অপছন্দ করব, আমি ঘৃণা করব।

এবং এই তিনটা জিনিস যখন দাওয়াহর স্রোতে একসাথে হয়, তখন সমাজের মধ্যে দেখবেন ভাগ হয়ে যায়, সমাজের মধ্যে পোলারাইজেশন হয়, মেরুকরণ ঘটে। সব নবীদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন, এ জিনিসটা হয়েছে। এক পক্ষ ইমানের তাবুতে চলে আসে, আরেক পক্ষ কুফরের তাবুতে চলে যায়, শির্কের তাবুতে চলে যায়। তো আমার প্রস্তাবনা এটাই।

তাওহীদের দাওয়ার অংশ হিসেবে কী করবেন,

- যে মিথ্যা তন্ত্র মন্ত্র যে মিথ্যা ইলাহ গুলো আছে যাদের উপর আল্লাহর বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয় বর্তমান সময়ে, সেগুলোকে আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন। মিথ্যা দ্বীনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করবেন, সে মিথ্যা মূর্তিগুলোকে আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন, সেটা সেকুলার রাষ্ট্র হতে পারে, জাতিসংঘ হতে পারে, অন্য যে কোন কিছু হতে পারে, সেগুলোকে আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন। পাশাপাশি এগুলো বর্জনের দাওয়াহ আপনি করবেন সেটা নুসুসিভাবে অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই, পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে। এটা কুফর বিত তাগুতের অংশ হিসেবে।
- আর ঈমান বিল্লাহ হল পরিপূর্ণভাবে আপনি দ্বীন ইসলামকে আঁকড়ে ধরবেন। কোন কিছু ছেড়ে নয়, দ্বীন ইসলামের পুরো অংশটাকে আপনি গ্রহণ করবেন। ইসলামের পুরো ওয়ার্ল্ড ভিউ টা আপনি ধারণ করবেন, এবং এটার দিকে দাওয়াহ দিবেন।

এর পর আসে আমর বিল মা’রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার।

- ইসলামের শিক্ষার আলোকে সমাজের মুনকারগুলো নিয়ে বলা।

- সমাজ ও রাষ্ট্রের বিদ্যমান সমস্যাগুলোর ভায়াবল সমাধান হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপনা করা।

মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধান আপনি ইসলামের জায়গা থেকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তাদের সামনে ইসলামকে একটা ভায়াবল সলিউশন হিসেবে প্রেজেন্ট করবেন।

তারপর আসবে আল ওয়ালা ওয়াল বারা –

- কুফর এবং কুফরের অনুসারীদের কাছ থেকে বারাআত ঘোষণা করা।
- ইসলাম এবং সেকুলারিজমের যে দ্বন্দ্ব, আল্লাহর আইন এবং গাইরুল্লাহর আইনের যে দ্বন্দ্ব, এটাকে মূল প্রশ্ন হিসেবে সামনে নিয়ে আসা।
- মুসলিমরা আমাদের মিত্র। মত ও পথের ভিন্নতা থাকলেও। মুসলিমরা আপনার মিত্র হবে, সেটা মত ও পথের পার্থক্য থাকবে, আপনার সাথে মানহাজ মাসলাকের পার্থক্য থাকবে। সেটা সমস্যা নয়। কিন্তু মুসলিমরা, আহলুল কিবলা আপনার মিত্র হবে। আর যারা আহলুল কুফর, আহলুশ শিরক, তারা আপনার প্রতিপক্ষ হবে। এই জিনিসটা স্পষ্ট করতে হবে।
- আর সেক্যুলাররা আমাদের প্রতিপক্ষ।

এগুলো যদি করা হয় তখন অটোম্যাটিকালি ইসলাম ও সেক্যুলারিসমের দ্বন্দ্ব, আল্লাহর আইন এবং গাইরুল্লাহর আইনের দ্বন্দ্ব সমাজের প্রধান প্রশ্নে পরিণত হবে। নবীদের সময়ে বারবার এটাই হয়েছে।

এখন মূল প্রশ্ন হলো সংস্কার নাকি নির্বাচন, বা ফ্যাসিবাদ নাকি চেতনা, নাকি এ দল নাকি বি দল, এ প্রশ্নগুলো আমাদের সমাজের মোটামুটি মূল প্রশ্নের জায়গায়। এই জায়গাটাতে তখন আসবে ইসলাম নাকি সেকুলারিজম। আল্লাহর আইন নাকি গাইরুল্লাহর আইন। আল্লাহর দ্বীন নাকি মানুষের বানানো দ্বীন। এ প্রশ্নগুলো তখন মৌলিক প্রশ্নের জায়গায় চলে আসবে।

এখানে দুটা অক্ষে কাজ করতে হবে, আদর্শিক ময়দানে এবং বাস্তব ময়দানে।

সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসম

এসব গুলোই পুরনো কথা। নতুন কিছু না। এর সাথে বাস্তব ময়দানে কাজের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিষয় অ্যাড করছি সেটা হল সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসম। এটাকে কমিউনিটি অর্গানাইযিং বা গ্রাসরুটস অ্যাক্টিভিসমও বলে। সহজভাবে এর মানে হল

- স্থানীয় পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে একত্রিত করা,

- তাদেরকে দ্বীনের দিকে ডাকা, এবং
- সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য তাদের শক্তি, সংখ্যা এবং রিসোর্সকে কাজে লাগানো।

আপনি নিজ এলাকায় হালাকা বা পাঠচক্র শুরু করেছেন। এলাকায় কিছু তরুণ একসাথে হয়ে কিছু সমাজকল্যাণমূলক কাজ করছেন। এলাকার ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন। এগুলো অ্যাক্টিভিসম।

স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টদের নিয়ে বিভিন্ন আয়োজন করছেন। ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, পর্ন অ্যাডিকশান, স্ক্রিন অ্যাডিকশান, টাইম ম্যানেজমেন্ট, বিভিন্ন সেলফ হেল্পার বিষয়। তাদেরকে নিয়ে খেলাধূলার আয়োজন করছেন বা ঘুরতে যাচ্ছেন। এগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান দিচ্ছেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকছেন। এগুলো অ্যাক্টিভিসম।

বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে সোচ্চার হচ্ছেন। মানুষকে অর্গানাইয করছেন। আলোচনা, সেমিনার, আয়োজন করছেন। লিফলেট দিচ্ছেন। পোস্টারিং করছেন। কোন কিছুর প্রতিবাদে মানববন্ধন করছেন, মিছিল করছেন। এগুলো সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসম

সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের উদ্দেশ্য কী?

এখন এই কর্মকাণ্ড গুলোর উদ্দেশ্য কি? এগুলো করে লাভটা কি?

উদ্দেশ্য হল সমাজে, জনপরিসরে দাঁড়ানোর জায়গা করে নেয়া

আমি বলছিলাম যে আপনি সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন আপনি যখন মুসলিম পরিচয় নিয়ে আসেন আপনি দুর্বল, আপনাকে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না, আপনাকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়, এই জায়গাটা পরিবর্তন করা। এবং এই জায়গাটা আপনাকে কাজ করে করে পরিবর্তন করতে হবে। একটা জায়গায় আপনাকে করে নিতে হবে, কেউ আপনাকে জায়গাটা এসে দিয়ে যাবে না।

উদাহরণস্বরূপ, আজকে এখানে যে শিল্পকলায় অনুষ্ঠান হচ্ছে, এর আগে এখানে এ ধরনের অনুষ্ঠান হয়েছে কিনা? না, যদিও হয়, কম হয়েছে এবং এটা কিন্তু মানুষের কাছে অপরিচিত একটা বিষয়। অনেক মানুষ একটু সন্দেহের চোখে দেখছেন, যে আসলে এখানে কি হচ্ছে? কেন হচ্ছে? এরকম নানা বিষয় আছে।

কিন্তু আপনি যদি এটা কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকেন, তখন কিন্তু এটা একসেপটেড হয়ে যাবে নরমালাইজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ আপনার দাঁড়ানোর জায়গাটা, বা সমাজের একসেপ্টেড হওয়া বা সমাজের কাছে নর্মালাইজ হয়ে যাওয়া, এই ব্যাপারটা কিছুটা হলেও অর্জন করতে পারবেন। এই যে মানুষের কাছে অপরিচিত, এই বিষয়টা আপনি ভেঙে দিতে পারবেন। তো এই জায়গাটা বর্তমানে আপনার নেই, এই জায়গাটা আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে। এ অবস্থাটা আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে। এটা কথা বলার মাধ্যমে হবে না, এটা অনলাইনে লেখালেখি করে হবে

না। এটা আপনার এই কাজগুলোর মাধ্যমে তৈরি করে নিতে হবে যেখানে আমি সোশ্যাল এক্টিভিজমের কথা বলছিলাম। এগুলোর মাধ্যমে জিনিসটা করে নিতে হবে।

পাশাপাশি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিজম এর আরেকটা উদ্দেশ্য হলো, জনগণের যে শক্তি এটাকে কাজে লাগানো।

মনে করেন কুমিল্লাতে কোন একটা এনজিও, একটা এলজিবিটিকিউ সেন্টার খুললো, কথার কথা। এখন এটার বিরুদ্ধে আপনি পাঁচ হাজার মানুষকে কি আপনি একত্রিত করতে পারবেন? জুমার পর না, জুমার পর পারবেন। জুমা ছাড়া অন্যদিন, অন্য যেকোনো সময় পারবেন কিনা? পারবেন না। প্রবাবলি পারবেন না। যদি পারেনও, আপনি কয়েকদিন তাদেরকে ওখানে রাখতে পারবেন? রাখতে পারবেন না। যদি পারেন, তাহলে এটা একটা শক্তি, অনেক বড় শক্তি আসলে।

জনগণের শক্তিটা আপনার কাছে এখন নেই। জনগণ এলজিবিটিকিউ পছন্দ করে না। আপনি যদি তার কাছে গিয়ে বলেন সে আপনার কথা সমর্থন করবে। সেই ইসলামকে সমর্থন করে, ইসলাম ভালো, সবকিছু আছে। কিন্তু তার সমর্থনটা নিষ্ক্রিয় সমর্থন। এই নিষ্ক্রিয় সমর্থন দিয়ে আপনার লাভ নেই। এটাকে আপনার সক্রিয় সমর্থনে পরিণত করতে হবে।

সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসম সেটার একটা মাধ্যম, এর মাধ্যমে আপনি এই জিনিসটা অর্জন করতে পারবেন।

সংগঠিত জনশক্তি:

পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হলো মানুষকে শুধু মোবালাইয করলে হবে না। আমাদের এখানে ইস্যু অনেকে ম্যাস মোবালাইযেইশান হয়। অনেক সময় এগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষও হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সেগুলোর সফলতা তেমন দেখা যায় না। ইস্যু ভিত্তিক সফলতা যদিও কিছু আছে।

যদি আপনি দীর্ঘমেয়াদে সফলতা চান, দীর্ঘমেয়াদে সামাজিকভাবে শক্তিশালী হতে চান, তাহলে এটা অ্যাড হক ভাবে হলে হবে না, এখানে অর্গানাইযড এফোর্ট লাগবে। তৃণমূল থেকে অর্গানাইযড এফোর্ট লাগবে। আপনার তৃণমূল থেকে জিনিসটা তৈরি করতে হবে। গ্রাসরুটস থেকে করতে হবে, তো নিজের এলাকা, নিজের প্রতিষ্ঠান, পাড়া-মহল্লা থেকে এই জিনিসটা তৈরি করতে হবে। তাহলে আপনি টেকসই শক্তি অর্জন করতে পারবেন। আপনাকে মানুষকে রাস্তায় নামাতে হবে এবং রাস্তায় রাখতে পারতে হবে।

আবারও বলছি, এই কাজটা সমাজে কাজ করে করে একটিভিজমের মাধ্যমে করতে হবে। এটা শুধুমাত্র বয়ান দিয়ে, কথা বলে হবে না। আমাদের সমাজে অনেক বক্তা আছেন, অনেক বড় বড় বক্তা আছেন, এবং তাদের লক্ষ লক্ষ বা ইভেন কোটি ভক্ত আছে। কিন্তু বক্তার ভক্ত দিয়ে এ কাজটা হবে না। আপনার কর্মী লাগবে, সমাজকর্মী লাগবে। আপনার একটিভিস্ট লাগবে।

ফোর্থ ওয়ে:

যদি এই দুটো অক্ষে, এই উদ্দেশ্যগুলো সামনে রাখে, এই কাজগুলো আপনি করতে পারেন। ১০-১৫ বছর ধরে তাহলে ইন শা আল্লাহ আপনি দুটো জিনিস অর্জন করতে পারবেন

১। সমাজের মনোজগতে পরিবর্তন।

২। এবং সামাজিক শক্তি

সমাজের মনোজগতে পরিবর্তন মানে সব মানুষ মুসলিম হয়ে যাবে? না, সব মানুষ আপনার চিন্তাকে ধারণ করবে? না। এটার মানে হলো, যারা আপনার পক্ষে না, তাদের কাছেও এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ হবে, তারা এটা নিয়ে ভাববে। সব মানুষ আপনার মতবাদ গ্রহণ করবে না, তবে সমাজকে এমনভাবে ভাবতে বাধ্য করা যেতে পারে যেন ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে এটি অবশ্যই প্রধান প্রশ্নে পরিণত করতে হবে: ইসলাম নাকি ধর্মনিরপেক্ষতা?

যে আপনার বিপক্ষে সেও এটা নিয়ে চিন্তা করবে। এটা হল সমাজের মনোজগতে পরিবর্তন। তাকে চিন্তা করতে হবে যে, আমার যে কোন একটা চুজ করতে হবে এখানে, আমার যে কোন একটা বেছে নিতে হবে, এই পরিবর্তনটা আসবে।

আর সামাজিক শক্তি মানে হল সহজ ভাষায় পারিপার্শ্বিকতাকে নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা এবং প্রভাব অর্জন করা এবং চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা, এবং সমষ্টিগত পদক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

সামাজিক শক্তির উদাহরণ হিসেবে ফরায়েজী আন্দোলন:

আপনাদের অনুষ্ঠানের শিরোনামে ইতিহাসের কথা আছে, সুতরাং আমি ইতিহাস থেকে আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেই। সামাজিক শক্তি অর্জনের ইতিহাস বা ঐতিহাসিক উদাহরণ হলো, আমার মতে, খুব ভালো উদাহরণ হলো, ফরায়েজী আন্দোলন। বাংলাদেশের বা পূর্ব বাংলার, ফরায়েজী আন্দোলন। আপনারা জানেন যে এই আন্দোলনটা শুরু হয় ১৮১৮ সালে। হাজী শরীয়তুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ এটা শুরু করেন।

অনেক ঐতিহাসিক বলেছেন যে ফরায়েজী আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ ভারতের, ব্রিটিশ শাসন আমলে ভারতের প্রথম অর্গানাইজড ইসলামিক মুভমেন্ট। ইভেন সৈয়দ আহমদ শহীদের যে আন্দোলন, তরিকায়ে মোহাম্মাদিয়া বা বালাকোট আন্দোলন, তারও আগে এটা শুরু হয়েছে। কারণ সৈয়দ আহমদ শহীদের অর্গানাইজড আন্দোলন শুরু হয়েছে উনি হজ থেকে ফেরার পর। দ্বিতীয়বার হজ থেকে ফেরার পর, ১৮২০ এর পর। হাজি শরীয়তুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর আন্দোলন শুরু ১৮১৮ থেকে। সুতরাং এজন্য বলা হয়, অনেকে বলেন যে, এটা হলো প্রথম অর্গানাইজড ইসলামিক আন্দোলন।

বিদ্যমান ন্যারেটিভের বাইরের কিছু বাস্তবতা:

এই আন্দোলনের ব্যাপারে আমাদের কিছু চিন্তাভাবনা আছে যে এটা ছিল মূলত একটা সমাজ সংস্কার মূলক বা ধর্মীয় সংস্কার মূলক আন্দোলন যে, ফরায়েজীরা কি করতো? তারা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত আদায় করতে বলতো, তারা বিদাআত থেকে দূরে থাকতে বলতো, শিরক থেকে দূরে থাকতে বলতো, হারাম থেকে দূরে থাকতে বলতো।

হ্যাঁ তারা এটা করতো, কিন্তু তাদের কার্যক্রম আসলে এর চেয়েও ব্যাপক ছিল, এখানে অন্যান্য আরো কিছু ডাইমেনশন ছিল। যেটা হয়তোবা আমরা জানিনা।

তাদের আন্দোলনের অর্থনৈতিক দিক ছিল, সামাজিক দিক ছিল, প্রশাসনিক দিক ছিল, রাজনৈতিক দিক ছিল। আমি সংক্ষেপে কয়েকটা দিক আপনাদেরকে বলি।

অর্থনৈতিক দিক:

সে সময় কৃষকদের ওপর জমিদার ও নীলকররা প্রচন্ড অত্যাচার করতো। অন্যায়ভাবে তাদের উপর বিভিন্ন ট্যাক্স বা কর চাপায়ে দিত। হাজী শরীয়াতুল্লাহ এই আর্থনীতিক শোষণের বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, এই ট্যাক্সগুলো অবৈধ। তিনি তার অনুসারীদের বললে, জমিদারদের আরোপ করা অতিরিক্ত ট্যাক্স দিবা না।

তার ছেলে মুহসীনউদ্দীন দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২) এই পলিসি কন্টিনিউ করেন। এবং তিনি একটা স্লোগান চালু করেন – লাঙ্গল যার, যমীন তার। যে জমিতে লাঙ্গল দেয়, যমীন তার। কাজেই সে জমিদারদের এতো কর দিতে বাধ্য না।

এবং ফরায়েজীরা জমিদার এবং সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এবং সফলভাবে পালন করেন। অনেক ইতিহাসবিদ বলেছেন, উপমহাদেশে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন হাজী শরীয়াতুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ। মোহনদাস গান্ধী না।

সমাজের ইসলাহ:

সমাজ সংস্কারেরটা আমরা জানি যেমন শির্ক বিদাতের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান, আশরাফ আতরাফ একটা বিভাজন ছিল সমাজের মধ্যে। মুসলিম সমাজের মধ্যে। যেটার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এই বিভাজন গুলোর বিরুদ্ধে তারা কাজ করেছেন। এবং তারা মুসলিম পরিচয়ের ভিত্তিতে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের উপর জোর দিয়েছেন, যে কারণে পূর্ববঙ্গের, কৃষক, তাঁতি, জেলে, তাদের অবস্থা ছিল সমাজে সবচেয়ে নিষ্পেষিত, সবচেয়ে নিপীড়িত অংশ। তাদেরকে তারা একত্রিত করে একটা সামাজিক শক্তিতে পরিণত করেছিলেন।

সাংগঠনিক কাঠামো:

পাশাপাশি তাদের একটা সাংগঠনিক কাঠামো ছিল। যেমন

- ৩০০০-৫০০ ফরায়েজী পরিবার নিয়ে হতো একটা গ্রাম বা গাও। এদের একজন দায়িত্বশীল থাকতো। গাও খালিফাহ বলতো
- ১০ বা তার চেয়ে বেশি গ্রাম নিয়ে একটা গির্দ বা সার্কেল। গির্দ সম্ভবত একটা ফারসী শব্দ। সার্কেল বলা যেতে পারে।
- পুরো পূর্ব বাংলা বিভিন্ন গির্দ বা সার্কেলে ভাগ করা ছিল। একটা গির্দে তাহলে ৩-৫ হাজার ফ্যামিলি
- এগুলোর তত্ত্ববধান করতেন মজলিশ শূরার সদস্যরা।
- আর মজলিশ শূরার নেতৃত্বে ছিলেন উস্তাদ। হাজী শরীয়াতুল্লাহ বা তারপর দুদু মিয়া

এটা ছিল তাদের অর্গানাইযেইশানাল স্ট্রাকচার। একটা হায়ারার্কিকাল পিরামিড স্ট্রাকচার বলা যায়।

প্যারালাল প্রশাসন:

এইসব কর্মকান্ড, পলিসি, সমাজ সংস্কার এবং স্ট্রাকচারের মাধ্যমে ফরায়েজীরা একটা প্যারালাল প্রশাসন গড়ে তুলেছিলেন।

হেনরি বেভেরিজ নামে একজন ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট ছিল, তার একটা মন্তব্য ছিল দুদুমিয়ার ব্যাপারে, সে হলো বাংলার ডি ফ্যাক্টো রুলার। সে প্রকৃতপক্ষে বাংলার প্রকৃত শাসক। এবং সে বলেছিল যে বাকেরগঞ্জের এরিয়ায় কোন জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে দুদুমিয়ার ক্ষমতা বেশি।

ড. জেমস ওয়াইজ একজন ছিল, ১৮৮৩ সালে সে একটা বই লিখেছিল, বা রিপোর্ট তৈরি করেছিল, ব্রিটিশদের জন্য, ফরায়েজী আন্দোলন নিয়ে। ওইখানে উনি বলছেন যে, ফরায়েজীদের শরিয়া আদালত ছিল, যেখানে তারা হানাফী ফিকহ অনুযায়ী বিচার করতো। এটা গ্রামের পঞ্চায়েতের স্টাইলে চলত। উনি বলছেন যে বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে এরকম ২২ টি শরীয়াহ আদালত ছিল। এখানে আপিল করা যেত, আপনার গাও খলিফার ওখানে যে বিচার হয়েছে সেটা যদি আপনার পছন্দ না হয়, আপনি উপরে যেতে পারবেন এবং ফাইনালি আপনি মূল যে আমির বা মুল যে উস্তাদ তার কাছে যেতে পারবেন। এই সিস্টেমটা তাদের ছিল। এবং ফরায়েজীরা তাদের কোন মোকাদ্দমা নিয়ে কখনও ব্রিটিশদের কোন আদালতে যেত না। এবং তারা এই আইনকে প্রত্যাখ্যান করত।

পাশাপাশি তারা সাদাকা তুলত, যাকাত আদায় করতো, নিজেদের সদস্যদের শিক্ষা, তারবিয়া, তাবলীগী বিভিন্ন ব্যবস্থা করত, মসজিদ মাদ্রাসা স্থাপন করতো, এভাবে তারা একটা প্যারালাল প্রশাসন তৈরি করে ফেলেছিল। এবং নবীনচন্দ্র সেন, তার একটা বিখ্যাত উক্তি ছিল, ফরায়েজীরা ব্রিটিশ রাজের মধ্যে, একটা State within a state কায়েম করেছিল। রাষ্ট্রের ভিতরে তারা আরেকটা রাষ্ট্র তৈরি করেছে।

রাজনৈতিক অক্ষ:

রাজনৈতিক দিক ছিল, রাজনৈতিক দিক চিন্তা করেন যে তারা চর দখল করত, খাস মহল নামে একটা জিনিস আছে সেটা দখল করতো, তাদের লাঠিয়াল বাহিনী ছিল, লাঠিয়াল বাহিনীর বর্শা ছিল, তীর ছিল, এই টাইপের জিনিসপত্র ছিল।

এবং তাদের ভায়োলেন্সের ক্যাপাসিটি ছিল। কারণ জমিদারদের সাথে তাদের মারামারি হইত। এই মারামারি করার ক্যাপাসিটি তাদের ছিল। পাশাপাশি তারা বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন করেছেন, কৃষকদের নিয়ে, তারা কোয়ালিশন করেছেন, জোট তৈরি করেছেন, বিভিন্ন সময়ে। নীলকরদেরবিরুদ্ধে, জমিদারদের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে, তারা ইভেন হিন্দু গোয়ালা, হিন্দু কৃষক এদেরকে একসাথে নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন করেছেন। **১৮৩৭**, **১৮৪৪**, **১৮৪৭**, এই সময় অনেক কৃষক আন্দোলনে তারা নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুতরাং এগুলো হলো তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড বা রাজনৈতিক স্ট্রাটেজির কিছু এক্সাম্পল।

দারুল হারব:

আবার দেখেন, ফরায়েজীদের অবস্থান ছিল শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ, উনি **১৮০৩** সালে একটা ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, এটা হল দারুল হারব। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতবর্ষ দারুল হারব। ফরায়েজীরা মনে করত ভারতবর্ষ দারুল হারব। এবং এর জন্য তারা জুমার সালাত আদায় করত না। জুম্মার নামাজ পড়তো না। এখন ফিকহি একটা বিষয় এখানে, মতপার্থক্যের জায়গা এখানে আছে, ওটা পয়েন্ট না। পয়েন্টটা হল এটা একটা পলিটিকাল পজিশন ছিল তাদের। এবং তারা ব্রিটিশ আইনকে যে প্রত্যাখান, এটা তাদের মধ্যে ছিল, তারা ব্রিটিশদের শাসন কে প্রত্যাখ্যান করে। তারা এটাকে গ্রহণ করে না, তারা এটাকে মানে না।

ফরায়েজীদের সাথে তিতুমীরের আন্দোলনের একটা সম্পর্ক ছিল। সমসাময়িক দিক থেকে, তাদের ওখানে একটা সম্পর্ক ছিল। সৈয়দ আহমদ শহীদের যে অনুসারীরা, পরবর্তীতে কাজ করে গিয়েছেন, মাওলানা উইলায়াত আলী, মাওলানা ইনায়াত আলী, তাদের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক ছিল। তারা তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। পাশাপাশি **১৮৫৭** সালে যে আজাদী আন্দোলন বা বিদ্রোহ, সেখানে তারা সাহায্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় হল, তারা দারুল হারব বলেছেন, তারা তিতুমীরকে সাহায্য করেছেন, সৈয়দ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ কে সাহায্য করেছেন, কিন্তু তারা নিজেরা কিন্তু জিহাদ করেনি।

এটা কেন করেননি সেটার স্পষ্ট কোনো উত্তর নেই। কিন্তু একটা উত্তর আমরা ধরে নিতে পারি। সেই উত্তরটা এরকম হতে পারে যে **১৮৩১** সালের মে তে, বালাকোটে সাইয়েদ আহমদ শহীদের যে আন্দোলন, তারা পরাজিত হলেন। আপাতভাবে পরাজিত হলেন। **১৮৩১** এর নভেম্বরে, বারাসাতে বাঁশের কেল্লা, তিতুমীরের যে বাঁশের কেল্লা, সেটাও পরাজিত হলো। ছয় মাসের ব্যবধান। এরপর হয়তোবা হাজী শরীয়তুল্লাহ মনে করেছেন যে, এই বাস্তবতায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, সশস্ত্রভাবে আন্দোলন করা হয়তোবা সমীচীন না বা ভায়াবল না। হয়তোবা এটা চিন্তা করেছেন।

এই কারণে তারা একটা দীর্ঘমেয়াদি স্ট্রাটেজি গ্রহণ করেছেন, যেটার উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক শক্তি অর্জন, সামাজিক আন্দোলন, সমাজ পরিবর্তন ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মাধ্যমে তারা চেষ্টা করেছেন সমাজের মধ্যে ইসলাহ করতে, সমাজের মধ্যে তাজদিদ আনতে এবং জমিদার, নীলকর এবং ব্রিটিশদের মোকাবেলা করতে।

ফরায়েজী আন্দোলন ও সামাজিক শক্তি:

এখন সব মিলিয়ে আমি মনে করি যে ফরায়েজী আন্দোলন সামাজিক শক্তি অর্জনের একটা কার্যকরী এক্সাম্পল হতে পারে। কিভাবে তৃণমূল থেকে আপনি সামাজিক শক্তি অর্জন করতে পারেন, এবং সেটা ধাপে ধাপে সামাজিক আন্দোলনের দিকে কিভাবে নিতে পারেন, সেটার একটা এক্সাম্পল আপনি এখানে পেতে পারেন।

ফরায়েজী আন্দোলন থেকে এটাও শেখার বিষয় যে – অ্যাড হক ভাবে, বা স্রেফ বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক ভাবে আন্দোলন বা বিক্ষোভ করে লং টার্ম পরিবর্তন আসবে না। দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন আনতে হলে অর্গানাইযড ভাবে তৃণমূল পর্যায় থেকে শক্তি তৈরি করতে হবে। ম্যাস মোবালাইযেইশান এবং যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার দীর্ঘমেয়াদী সক্ষমতা তৈরি করতে হবে।

এই মডেলটাকে সামাজিক শক্তি অর্জনের একটা মডেল হিসেবে সামনে রাখতে পারেন। নন-আর্মড, সামাজিক আন্দোলনের মডেল।

প্যারালালস/সাদৃশ্য:

চাইলে ফরায়েজিদের আমরা কিছু প্যারালালস বা মিল খুজে বের করতে পারি।

- ফরায়েজীদের দুটো প্রতিপক্ষ ছিল, হিন্দু জমিদার শ্রেনী এবং ব্রিটিশ রাজ। আমাদের সময়ে
    - হিন্দু জমিদারের ভূমিকায় আছে - সেক্যুলার প্রগতিশীল গোষ্ঠী, কালচারাল এলিট, এবং ভারত
    - আর ব্রিটিশ রাজের ভূমিকায় আছে –
        - পশ্চিমা বিশ্ব এবং
        - এই রাষ্ট্র বা পোস্ট-কলোনিয়াল সেক্যুলার স্টেইট- কারণ এরা ব্রিটিশদের সিস্টেমটাই চালায়ে নিয়ে যাচ্ছে, কলোনিয়াল লেন্সে ইসলাম ও মুসলিমদের দেখছে এবং নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করছে। তাদের মতো করে সে আপনাকে দেখে, তাদের মত করে সে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ বা দমন করতে চাই।

- স্ট্র্যাটিজির ক্ষেত্রে – তাদের স্ট্র্যাটিজি ছিল সোশিও-পলিটিকাল।
    - সামাজিক শক্তি অর্জন। তারপর সেটাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিনত করা। আন্দোলন সংগ্রাম করা। নিজেদের আদর্শের জায়গায় ছাড় না দেয়া।
    - আমরাও তাই বলছি। ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে সমাজকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। শরীয়াহর সাথে আপোস না করে।
- ফরায়েজীরা ভারত উপমহাদেশজে আন্দোলন দারুল হারব মনে করতো, কিন্তু নিজেরা জিহাদ করেননাই। তারা মনে করেছেন এটা তাদের জন্য ভায়াবল না।
- আমরা একদিকে জাহিলিয়্যাহর বাস্তবতাকে চিহ্নিত করছি - সেকুলারিজমের, গাইরুল্লাহর আইনের, বা এই জাহিলিয়াতের বা এই রাষ্ট্রের বাস্তবতাগুলো চিহ্নিত করার কথা বলছি — অন্যদিকে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের কথা বলছি, নন-ভায়োলেন্ট অ্যাক্টিভিটির কথা বলছি। কোন সশস্ত্র আন্দোলনের কথা বলছি না।

এভাবে নানা দিক থেকে ফরায়েজীদের সাথে আমাদের পরিস্থিতির প্যারালাল বা মিল খুজে বের করা সম্ভব

সতর্কতা:

এখানে একটা বিষয় বোঝা দরকার সেটা হলো যে আমি আপনাকে হুবহু তাদেরকে কপি করার কথা বলছি না। উদাহরণস্বরূপ

- ফরায়েজীরা জুমার নামাজ পড়তেন না আমি বলতেছি না যে আপনারাও জুমার নামাজ পড়বেন না,
- ফরায়েজীদের লাঠিয়াল বাহিনী ছিল আমিও বলছি না যে আপনারা তীর ধনুক নিয়ে লাঠিয়াল বাহিনী তৈরি করুন।
- অথবা ফরায়েজীদের শরীয়া আদালত ছিল, আপনারা সবাই বের হয়ে গিয়ে এখন শরীআহ আদালত কায়েম করেন এগুলো আমি এটা বলছি না।

আমি হুবহু অনুসরণ করার কথা বলছি না। আমি বলছি যে as a model এখান থেকে শিক্ষা নেওয়া পসিবল।

শরিয়ার সাথে আপোষ না করেও যে কাজ করা যায়, শূন্য থেকে শুরু করে যে সামাজিক শক্তি অর্জন করা যায়, সামাজিক আন্দোলন তৈরি করা যায়, এটার একটা প্রমাণ হলো ফরায়েজীরা, এটার একটা মডেল হল ফরায়েজীরা। এখান থেকে আপনি শিক্ষা নেন, এখান থেকে আপনি চিন্তার খোরাক নেন। এটা ২০০ বছর আগের একটা বিষয়। এটা সবসময় হুবহু একইভাবে আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন, বাস্তবায়ন করতে পারবেন, এটা আসলে হবে না। পার্থক্য থাকবে। মিল থাকলে অমিল থাকবে, এই মিল অমিলের জায়গাগুলো রেখেই এখান থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া

যায় কিনা বা চিন্তার খোরাক নেওয়া যায় কিনা, এই বিষয়টা আমি বলছি। আবারও বলছি, হুবহু অনুসরণ করতে বলছি না।

বর্তমানে কি এভাবে কাজ করা সম্ভব?

এখন এখানে একটা প্রশ্ন আছে বা অনেকগুলো প্রশ্ন আছে, একটা প্রশ্ন হল বর্তমানে কি আসলে এরকম কাজ করা যাবে কিনা? আমি যেটা বললাম সেটা ২০০ বছর আগের উদাহরণ। বর্তমান পৃথিবীও অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেক, আর এখন তো মনে করেন রাজনীতি বলতে আমরা সবাই নির্বাচনী রাজনীতিকেই বুঝি। এটার মাধ্যমে তো আসলে সবাই পরিবর্তন এর চেষ্টা করে, এটা দিয়ে করা, এই পদ্ধতি দিয়ে কি আসলে হবে? সামাজিক আন্দোলন, সামাজিক শক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো দিয়ে হবে কিনা?

এটার উত্তর হল, অবশ্যই হবে এবং শুধু হবেই না, এটা নির্বাচনী পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী একটা পদ্ধতি, এটা অনেকভাবে প্রমাণ করা যায়। আমি এখানে কয়েকটা ভাবে প্রমাণ দিচ্ছি।

ফলস বাইনারি:

আমরা অনেকে মনে করি অপশান মনে হয় দুটো –

হয় নির্বাচনী রাজনীতি, না হলে সশস্ত্র আন্দোলন।

এ দুইয়ের বাইরে কিছু নাই।

- হয় নির্বাচনী গণতন্ত্র করতে হবে, অথবা সশস্ত্র আন্দোলন করতে হবে,
- অথবা চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে হবে।
- ব্যাপারটা আসলে এরকম না।

এ দুটোর বাইরে, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের আরও বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি আছে।

এর বাইরে আর কোন অপশন নেই। বা এর বাইরে আসলে অপশন আছে, ঐতিহাসিকভাবে অপশন আছে, সামাজিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের বলেন, আন্দোলনের বলেন, অনেক উদাহরণ ইতিহাসে আছে।

ইতিহাস থেকে আরগুমেন্ট:

নির্বাচনী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে নতুন একটা পদ্ধতি। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আজ থেকে ৫০-৬০ বছর পূর্বে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো না। ৫০-৬০ বছর বলছি, ১০০ না কিন্তু। এটার প্রমাণ আছে।

আপনারা স্যামুয়েল হান্টিংটনের নাম শুনেছেন অনেকে। ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইযেশান নামের থিসিস যেটা সেটার লেখক, এই তত্ত্বের জনক, তার আরো একটা কাজ আছে, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century" (1991)।

সেখানে সে বলছে,

- ১৯২৫ সালের দিকে পৃথিবীতে নির্বাচনী গণতন্ত্র ছিল ২৯ টি দেশে,
- ১৯৬২ সালের দিকে ৩৬ টি দেশে,
- ১৯৯০ এর দিকে এ সংখ্যাটা হচ্ছে ৬০।

পৃথিবীতে বর্তমানে দেশ কয়টা? ১৮০ এর বেশি, বা ১৯০ এর বেশি। ১৯৯০ এর দিকে ৬০ টা।

একই ধরনের তথ্য আছে The Economist এর Intelligence Unit এর ডেমোক্রেসি ইনডেক্সসহ নানা গবেষণা ও জরিপে। ১৯৬০/৭০ এর আগে, খুব অল্প দেশে নির্বাচনী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছিল।

তো তার আগে মানুষকে রাজনীতি করেনি? তার আগে মানুষ আন্দোলন করেনি? তার আগে মানুষ দাবি-দাওয়া আদায় করেনি? করেছিল। কিভাবে করেছিল তারা? এটা যদি একমাত্র পদ্ধতি হয় তাহলে কিভাবে করেছে? এটার বিভিন্ন পদ্ধতি আসলে ছিল, এগুলো নিয়ে বিস্তর আলোচনা লিটারেচারের মধ্যে আছে। একাডেমিক লিটারেচার বিস্তর আলোচনা আছে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডের এপ্রোচের কথা আপনি পাবেন।

ম্যাস পলিটিক্স, সোশ্যাল মুভমেন্ট স্ট্র্যাটিজি, সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স, সিন্ডিক্যালিসম, ডাইরেক্ট অ্যাকশন, নন-ভায়োলেন্ট রেসিসট্যান্স ইত্যাদি অনেকগুলো নাম আছে।

মূল কথা, এগুলোর মৌলিক অর্থ কি? মৌলিক অর্থ হলো, extra-parliamentary politics। মানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা সামাজিক কর্মকান্ড, যেটা পার্লামেন্টারি না। যেটা সংসদের মধ্য দিয়ে হয় না। এর বাইরেও অনেক কিছু করার আছে। অর্থাৎ নির্বাচনী রাজনীতির বাইরেও আন্দোলন সংগ্রামের লম্বা, সমৃদ্ধ এবং সফল ইতিহাস আছে।

অর্জন:

যদি সফলতার কথা চিন্তা করেন তাহলে নির্বাচনী যে রাজনীতি, এর সাথে এ ধরনের আন্দোলন-সংগ্রামের কোন তুলনাই হয় না। গত ১৫০ বছরে যতগুলো মিনিংফুল, অর্থবহ সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে পুরো পৃথিবীতে, তার কোনোটা নির্বাচনী রাজনীতির মাধ্যমে আসেনি।

গতো দেড়শো বছরে যতো মেজর সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে, সেগুলোর প্রায় কোনটাই নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে আসে নাই। এগুলো এসেছে গণআন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন, সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স, নন ভায়লেন্ট রেসিস্টেন্স – ইত্যাদি আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে। বিভিন্ন এক্সট্রা পার্লামেন্টআরি অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে। এটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সত্য। সংস্কারমূলক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সত্য।

আমি উদাহরণ দিচ্ছি।

বৈপ্লবিক পরির্তনঃ

বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা যদি বলেন, এক ব্যবস্থা গিয়ে আরেক ব্যবস্থা এসেছে— রাশিয়ার বিপ্লব, চীনের বিপ্লব, কিউবার বিপ্লব, - এগুলো কোনটাই নির্বাচনী রাজনীতির মাধ্যমে হয় নাই।

মুসলিম বিশ্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তন:

মুসলিম বিশ্বে দেখেন, ইমারাতে রীফ, মোহাম্মদ বিন আব্দুল কারীম আল খাত্তাবী, একটা ইমারত কায়েম করেছিলেন, ইসলামী ইমারত কায়েম করেছিলেন যেটা শরীয়ত দিয়ে শাসন হতো। এটা ১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত টিকে ছিল মরক্কোতে। এটা ওসমানীদের পতনের পর প্রথম শরীয়াহ শাসনের উদাহরণ বলা যায়। সেটা নির্বাচনের পদ্ধতির মাধ্যমে হয়নি।

ইরানি যে শিয়া বিপ্লব এসেছে সেটা নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে হয়নি।

আফগানিস্তানে যে দুইবার ইসলামী ইমারত কায়েম হয়েছে, এটা নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে হয়নি। এটা হল বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

সংস্কারমূলক পরিবর্তন:

সমাজ সংস্কারের পরিবর্তন কিভাবে এসেছে? আপনি দেখেন, বড় বড় কিছু উদাহরণ দিই,

ফিলিস্তিনের প্রথম ইন্তিফাদা, ১৯৮৭ থেকে ৯৩ পর্যন্ত। প্রথম যে ইন্তিফাদা। এই প্রথম ইন্তিফাদা নির্বাচনী পদ্ধতিতে হয়নি।

আমেরিকার সিভিল রাইটস মুভমেন্ট, যেটার মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের অধিকার পেয়েছে, নির্বাচনের, নির্বাচনে ভোট দেওয়া, অন্যান্য অনেক অধিকার। সেটা নির্বাচনী পদ্ধতিতে হয়নি।

লেবার রাইটস মুভমেন্ট, বা শ্রম অধিকার যেটা, যে ৪ hour workday, যে আট ঘন্টা কাজ হবে এর চেয়ে বেশি না, শিশুশ্রম হবেনা, ওয়ার্কপ্লেসে নিরাপত্তা লাগবে।

এগুলো কীভাবে হয়েছে? এগুলো আন্দোলনের মাধ্যমে এসেছে, নির্বাচনের মাধ্যমে আসেনি।

সাউথ আফ্রিকাতে বর্ণবাদী শাসন ছিল, এটা যে অবসান হল আন্দোলনের মাধ্যমে এটাকে বলা হয় anti apartheid movement বা বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন। নির্বাচনী মাধ্যমে হয়নি, এটা আন্দোলনের মাধ্যমে এসেছে।

আরব বসন্ত, আরব বসন্তের কথা আমরা জানি যে এটার মাধ্যমে অনেক তাগুতের পতন হয়েছে। যারা দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করছিল। কয়েক দশক ধরে। তাদের যে পতন ঘটেছে সেটা কিন্তু নির্বাচনী গণতন্ত্রের মাধ্যমে হয়নি, বা নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে হয়নি। বরং এটা বলার সুযোগ আছে, যে একবার পতন হওয়ার পর, আন্দোলনের মাধ্যমে পতন হওয়ার পর যখন নির্বাচনে গিয়েছে তখন অর্জনটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই প্রমাণ আছে।

এগুলো হলো সংস্কারের উদাহরণ, এখানে আমূল পরিবর্তন আসেনি, উদাহরণস্বরূপ আরব বসন্তের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন আসেনি, কিন্তু সংস্কার এসেছে। এবং এই যতগুলো আন্দোলন বললাম, সংস্কারের, এগুলোতে কি কি পদ্ধতি ছিল? বয়কট, অবস্থান ধর্মঘট, বিক্ষোভ, হরতাল, গণ আন্দোলন, এই টাইপের জিনিসপত্র। সামাজিকভাবে সংঘটিত হওয়া, তৃণমূল থেকে শক্তি তৈরি করা, অর্গানাইজড হওয়া, এই ব্যাপারগুলো। নির্বাচনী পদ্ধতি ছিল না।

আমি দুই ধরনের পরিবর্তনের পদ্ধতি আপনাদেরকে বললাম। একটা হল বৈপ্লবিক পরিবর্তন একটা হল সংস্কারমূলক পরিবর্তন। এ দুইটা পদ্ধতির কোনটাই নির্বাচনী গনতন্ত্রের মাধমে, নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে আসেনি বললেই চলে, কাজেই সামাজিক বলেন, রাজনৈতিক বলেন, দুই ক্ষেত্রেই আপনি যদি পরিবর্তন আনতে চান, বৈপ্লবিক বলেন সংস্কার বলেন, এটা অনেক বেশি ভায়াবল পদ্ধতি, এটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ পদ্ধতি। কিন্তু নির্বাচনী পদ্ধতিতে এর মত কোন উদাহরণ নেই।

বাংলাদেশের উদাহরণ:

এবার আপনাদেরকে আমাদের দেশের উদাহরণ দেই, আমাদের দেশে যত বড় বড় পরিবর্তন এসেছে, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১, ৯০ এর গণ অভ্যুত্থান, জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান, নির্বাচনী পদ্ধতিতে কোনটা হয়েছে বলেন? একটাও এখানে নির্বাচনী পদ্ধতিতে হয়নি।

আমরা তো এখন কিছু কথা নিয়মিত শুনছি।

- সংবিধান মেনে অভ্যুত্থান করি নাই। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অভ্যুত্থান হয় নাই।
- বরং এখানে নির্বাচন দেয়া নিয়ে শঙ্কা কাজ করছে, যে নির্বাচন দিলে তো কোন সংস্কার আর হবে না।
- গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা সরকারের মাধ্যমে সংস্কার করে ফেলতে হবে।

আন্দোলন-সংগ্রাম ইফেক্টিভ আর নির্বাচনী রাজনীতি যে ইফেক্টিভ না, এটার আরও প্রমান দেয়া লাগবে?

অর্থাৎ যেটাকে মূল পদ্ধতি মনে করা হয়, মানে আমরা সমাজ যেটাকে (নির্বাচনী গণতন্ত্র) মূল পদ্ধতি মনে করে, আবার সমাজ থেকেই বলে যে আসলে এটা দিয়ে আসলে সংস্কারও আসবে না। এটা হল বাস্তবতা, আর কি উদাহরণ লাগবে আপনার?

বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের আন্দোলন

বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের উদাহরণ দেখেন। বাংলাদেশের যে অর্জনগুলো আছে, আংশিক অথবা পূর্ণাঙ্গ, এসবগুলো এসেছে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে। মুফতি আমিনী রহিমাহুল্লাহ, শাইখুল হাদিস রহিমাহুল্লাহ, আল্লামা আহমদ শফী রহিমাহুল্লাহ, বা অন্যান্য ইসলামপন্থীদের যতগুলো আন্দোলন আছে, সফলতা আছে, কোনটা নির্বাচনী পদ্ধতিতে এসেছে?

তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, এটা কিভাবে হয়েছে? কোথায় হয়েছে? রাজপথে হয়েছে।

সিডও সনদ যে বাতিল করা, কোথায় হয়েছে? গণআন্দোলনে হয়েছে। ২০১৩ সালের যে হেফাজতে ইসলামের আন্দোলন, শাপলা চত্বরে যে আন্দোলন, কোথায় হয়েছে? নির্বাচনী পদ্ধতিতে হয়েছে কিনা? হয়নি। গণআন্দোলনের মাধ্যমে হয়েছে। এগুলো হলো অর্জন।

আর নির্বাচনী রাজনীতির মাধ্যমে কি পেয়েছেন আপনি? কিছুই পাননি, বরং, যারা সফেদ পোশাকের মানুষ, তাদের পোশাকে দাগ লেগেছে। আপনার এমন সব মানুষের সাথে জোট করতে হয়েছে, এমন সব বিষয় মেনে নিতে হয়েছে, যেটা কোনভাবেই ইসলামী আদর্শ বলেন, বা ইসলামের রাজনীতি বলেন, বা আলেম-ওলামাদের যে শান বা মর্যাদা, এটার সাথে কোনোভাবেই যায় না। এটা বাস্তবতা।

এটা কঠিন বাস্তবতা যেটা আপনি রেটরিক দিয়ে কিংবা আবেগ দিয়ে চাপা দিতে পারবেন না। কাজেই নির্বাচনী রাজনীতির তুলনায়, এক্সট্রা পার্লামেন্টারি যে পলিটিক্স, এটা সব সময় বেশি সফল, বেশি কার্যকরী এটা নানাভাবে প্রমাণ করা যায়।

নির্বাচনী রাজনীতির সমস্যা:

আর নির্বাচনী রাজনীতি তো একদিকে কার্যকরী না, অন্যদিকে এখানে নানা সমস্যাও আছে।

শার'ঈ সমস্যা:

- এর মধ্যে প্রথম এবং প্রধান সমস্যা হল থিওলজিকাল প্রবলেম
- আকাইদী প্রবলেম আছে, শার'ঈ প্রবলেম
- আল্লাহর আইনের বদলে অন্য আইনে শাসন,

- আল্লাহর আইনকে অকার্যকর নতুন আইন প্রনয়ন
- হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা
- এবং গায়রুল্লাহর আইন মানুষের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপায়ে দেয়া
- কেউ বিরোধিতা করলে তাকে দমন করা

এ বিষয়গুলো শরীয়াহর সাথে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক,

- এবং নির্বাচনী পদ্ধতিতে কেউ যদি ক্ষমতায় যায়, তাহলে এই মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো সে অ্যাভয়েড করতে পারবে না
- আজ পর্যন্ত কেউ অ্যাভয়েড করতে পারে নাই, আজ পর্যন্ত কেউ অ্যাভয়েড করার ক্ষেত্রে কার্যকরী কোন অ্যাপ্রোচ আনতে পারে নাই
- আপনি এমন একটা পদ্ধতি নিচ্ছেন যেখানে অবধারিতভাবে শরীয়াহর সাথে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক কিছু কাজ করতেই হবে। এড়ানোর কোন উপায় নাই।
- তো এখানেই প্রধান এবং মূল আপত্তি।
- এঈ আলোচনাতে আপাতত আজকে গেলাম না

এর বাইরেও নির্বাচনী রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা আছে। একটা প্রবলেম তো অলরেডি বলেছি যে, এটার মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তো সম্ভবই না, এটার মাধ্যমে অর্থবহ সংস্কারও সম্ভব না। এটার মাধ্যমে বিপ্লবী কোন পরিবর্তন সম্ভব না, এটার মধ্যে মিনিংফুল কোনো সংস্কারও সম্ভব না। এটা অকার্যকর, অদক্ষ, ineffective একটা পদ্ধতি।

সামাজিক অঙ্গন > রাজনৈতিক ময়দান

আরেকটা দুর্বলতা হলো যে, সমাজের চিন্তার যে কাঠামো তৈরি করে দেয় সেকুলার প্রগতিশীলরা, সেটাকে আপনি এটার জায়গা থেকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। কারণটা হলো, একটা কথা আছে, politics is downstream from culture, মানে হলো, সংস্কৃতি আর সমাজ হল উজানে, আর রাজনীতি হলো ভাটিতে। পানি উজান থেকে ভাটিতে আসে নাকি ভাটি থেকে উজানে যায়? উজান থেকে ভাটিতে আসে।

সমাজের যে মূল্যবোধ থাকে, সাংস্কৃতিক যে মূল্যবোধ থাকে, এটা রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। এটার মানে কি? এটার মানে হলো, রাজনৈতিক দলগুলো সমাজের মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তারা সমাজের মূল্যবোধকে পরিবর্তন করতে পারে না। এটা হয় না। এজন্য আপনি দেখবেন যে, সমাজের মূল্যবোধ যখন পরিবর্তন হয়, তখন রাজনৈতিক দলগুলোর কথা পরিবর্তন হয়ে যায়। তাদের ভাষা পরিবর্তন হয়ে যায়, তাদের স্লোগান পরিবর্তন হয়ে যায়, তাদের লেবাস পরিবর্তন হয়ে যায়, তাদের দাড়িটা একটু ছোট হয় তাদের প্যান্টটা একটু লম্বা হয়।

অর্থাৎ রাজনৈতিক দল সবসময় সমাজের প্রচলনকে মেনে নেয়। বিপ্লবী দলের ব্যাপার ডিফারেন্ট, সাধারণ গতানুগতিক রাজনৈতিক দল সবসময় প্রচলন এর ভেতরে থেকে কাজ করে। এটাই নিয়ম। কাজে আপনি সমাজের বয়ানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না, সমাজের বয়ান আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, এটা বাস্তবতা। কাজেই এরকম যখন আপনি করবেন, তার নিয়মের ভিতরে, তার সীমানার ভিতরে কাজ করছেন, তখন বারবার আপনাকে দিক পরিবর্তন করতে হবে, তখন আপনার ইসলামের বিপ্লবের চিন্তা হয়ে যাবে কল্যাণরাস্ট্র, ইসলামী ইকামাতে দ্বীনের চিন্তা হয়ে যাবে কল্যানরাষ্ট্র, এবং এটা হবেই। এটা এই পথের অবধারিত ফলাফল।

নির্বাচনী গণতন্ত্র হেজেমনিকে রিএনফোর্স করে

আপনি সিস্টেমের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন, এবং এটার প্রেক্ষিতে নিজের আদর্শের জায়গায় আপনাকে আপোষ করতে হবে। নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে, এবং এটাই সব সময় হয়। এটা এমন একটা মেশিন, এ মেশিনের ভেতরে ঢুকলে ওই সাইডে এই জিনিসটাই বের হবে, দ্য হাউস অলওয়েজ উইনস, এর ব্যাত্যয় কখনো হবে না। এবং এটা মানুষের মধ্যে কনফিউশন তৈরি করে, আপনি বললেন যে পশ্চিমা কোন ধর্মহীন গণতন্ত্র, ওটা হারাম, আপনি বললেন যে গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, আবার মানুষ দেখবে যে আপনি গণতন্ত্রের পথে গিয়েছেন, মানুষ কিন্তু এত চিন্তা করবে না, সে দুটো বিপরীতমুখী জিনিস একসাথে ধারণ করতে পারবে না। এটার একটা নাম আছে, Cognitive Dissonance বলা হয়।

দুইটা জিনিস সে ধারণ করতে পারে না, তখন কি হয়? মুখের কথার বদলে কাজটাকে সে প্রাধান্য দেয়। এবং তার মধ্যে এটার একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়ে যায়। এটা বাস্তবতা। ফাংশনাল একটা এক্সেপ্টেন্স তৈরি হয়ে যায়।

নির্বাচনী রাজনীতির হিসাবনিকাশ

পাশাপাশি এখানে অনেক বিষয় আছে, জোটের রাজনীতির বিষয় আছে, ভোটের রাজনীতির বিষয় আছে, অনেক কথা বলতে চাইলেও বলা যায় না, অনেক কাজ করতে চাইলেও করা যায় না, এবং একটা উদাহরণ আছে, মনে করেন, গত এক বছর ধরে ফিলিস্তিনের যে গণহত্যা হচ্ছে, এটা নিয়ে বাংলাদেশের যত বড় আন্দোলন হওয়ার কথা ছিল, এরকম কিছুই হয়নি, এরকম কোন কর্মসূচিও আসলে হয়নি। কেন হয় নাই? কারণ ওই সময় একটা চিন্তা ছিল যে আমেরিকা রাগ করবে। মনে আছে আপনাদের ওই সময়ের কথা? ৬ তারিখ নির্বাচন ছিল, এবং প্রবল বিশ্বাস ছিল যে আমেরিকা হয়তো সাহায্য করে শেখ হাসিনাকে ফেলে দিবে বা কিছু একটা হবে। তো আমেরিকা যদি এখন মন খারাপ করে? এজন্য তখন কিন্তু কিছু করা যায়নি। ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটা দেখেন, তেমন কিছু করা যায়নি। গতানুগতিক রাজনৈতিক জায়গাগুলোতে কিন্তু এগুলো নিয়ে কথা হয়নি। পত্রিকাতে এসেছে। সামাজিক ফ্রেম থেকে এসেছে, সুতরাং এগুলো বাস্তবতা।

এধরণের রাজনীতি কাউন্টার হেজেমনিকে আন্ডারমাইন করে

এরকম আসলে আরো অনেক বিষয় আছে, যেখানে আপনার সব পরিকল্পনা নির্বাচন কেন্দ্রিক করতে হয়, এবং এটার কারণে আপনি অন্য জায়গায় ফোকাস করতে পারেন না। তো আলটিমেটলি এটা প্রবলেমটা হলো যে, এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে গেলে, যে হেজেমনিটা আছে, বা তাদের যে বয়ানগুলো আছে, তাদের যে চিন্তার কাঠামো আছে, যেটা তারা সমাজের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, এটাকে চ্যালেঞ্জ করা, এটাকে ভাঙ্গা, এটা আসলে করা যায় না। বরং আপনাকে ওটার মধ্যে মিশে যেতে হয় এবং একটা সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হয়, এটা টেকসই হয় না, একসময় এটা কলাপ্স করে।

সামারি:

এই কারণে দেখবেন গত ১৫০ বছরে, মৌলিক কোন পরিবর্তন, বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা সংস্কার, কখনোই নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে আসেনি। যেটা এসেছে সেটা সামাজিক আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে অথবা রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে। বা রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে। এটা কি আপনি এক্সট্রা পার্লামেন্টারি পলিটিক্স বলতে পারেন। এটা তত্ত্ব নয়, এটা বাস্তবতা। বর্তমান আর অতীতের অনেক উদাহরণ এখানে আছে। কিছু আমি আপনাদেরকে দিলাম। ইভেন বাংলাদেশের গত ১০ থেকে ১২ বছরের কথা চিন্তা করেন, বড় বড় সবগুলো আন্দোলনের কথা চিন্তা করেন, হেফাজতে ইসলামের আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক, প্রথম কোটা আন্দোলন, জুলাইয়ের কোটা আন্দোলন, যেটা শেষে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছে। এগুলোর একটাও গতানুগতিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আসেনি।

এবং একটাও গতানুগতিক রাজনৈতিক শক্তি দিয়েও শুরু হয়নি। কাজেই এই পদ্ধতি আপনাকে সুযোগ দিবে যেটা আসলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া দেয়না, এটা আসলে প্র্যাগম্যাটিক কথা, মানুষ মনে করে যে ঠিক আছে আমরা বাস্তব বুঝি না এইটা সেইটা, এটা বাস্তবতা। আপনারা যেটার কথা বলছেন সেটা ফ্যান্টাসি। এটা বাস্তবতা, এটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা, এটা বর্তমানের বাস্তবতা।

শরীয়াহ কায়েম?

এখন কয়েকটা পয়েন্ট স্পষ্ট করি। আমি যেটা বলছি এটা হল সোশ্যাল এক্টিভিজমের কথা। এটাকে আমি শরিয়াহ কায়েমের পদ্ধতি হিসেবে বলছি না। আমি বলছি না যে অ্যাক্টিভিজমের মাধ্যমে শরীয়াহ কায়েম হয়ে যাবে বা এটা শরীয়া কায়েমের একটা নতুন মানহাজ। আমি এটা বলছি না যে সোশ্যাল এক্টিভিজম করলে আপনি তামকীন অর্জন করতে পারবেন এবং এখানে শরীয়াহ কায়েম হবে।

শরীয়াহ আসবে বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে

শরীয়াহ কায়েম হবে, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। এটাতে কোন সন্দেহ নেই, সংস্কারের কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে এটা কখনো হবে না। এবং এটা নতুন কোন কথা না, মাওলানা আব্দুর রহিম রহিমাহুল্লাহ, উনি আজ থেকে প্রায় ৩০-৪০ বছর আগে বই লিখে গিয়েছেন, গণতন্ত্র নয় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিপ্লব, আপনারা পড়তে পারেন, ওইখানে যা বলার উনি মোটামুটি সব বলে গিয়েছেন। এটা নতুন কোন কথা না।

এবং আপনি যদি ইতিহাসের দিকে তাকান, আমি ফিকহের আলাপ করছিনা, মাসাআলা মাসাইলের কথা বলছি না, আমি জাস্ট ইতিহাসের কথা বলছি— আপনারা দেখেন, সিরাতের ক্ষেত্রে, মদিনায় যে পরিবর্তন এটা কিভাবে এসেছে? মক্কার ফাতাহ যেটা ছিল সেটা কিভাবে এসেছে? বা এমনকি ইয়েমেনে, ফাইরুজ আদ দায়লামি রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি যখন ইয়েমেনের নিয়ন্ত্রণ নিলেন, আসওয়াদ আল আনসির কাছ থেকে, সেটা কিভাবে হয়েছে?

আধুনিক সময়ের কথা চিন্তা করেন, আধুনিক সময় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে সেটা কিভাবে এসেছে? রাশিয়ান বিপ্লব বলেন, ইরানের শিয়া বিপ্লব বলেন, এগুলো হলো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের একটা উদাহরণ। আরেকটা হল চীনের বিপ্লব, কিউবার বিপ্লব, বা আফগানিস্তানে যেটা হয়েছে, দুইটা উদাহরণ দিই, এর বাইরে তো আসলে আর কিছু নেই। একটা গণ বিপ্লব একটা জনযুদ্ধ। এর বাইরে আসলে তেমন কিছু নেই।

বৈপ্লবিক পরিবর্তন এভাবেই আসবে। আর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা হবে বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে। শরিয়াহর আলোকে বৈধ কোনো পথ ও পদ্ধতির সাথে আমার মৌলিক দ্বিমত নেই। তবে আমি বৈপ্লবিক কাজের কথা বলছি না। আমি বলছি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিসমের কথা। এটার মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে। ইসলাম কায়েম হবে এই দাবি আমি করছি না।

দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়াঃ

আরেকটা বিষয় হলো, মনে করেন কেউ শরিয়া কায়েমের জন্য কাজ করছে, ভালো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাদের সফলতা দান করুন, কিন্তু এ প্রসেস একটা লম্বা প্রসেস। এটা তো আমরা স্বীকার করি। এটা ১-২ দিনের প্রসেস না। দশকের পর দশক বা একাধিক দশকের একটা প্রসেস এটলিস্ট, তো এই সময়টাতে আপনার কী হবে? আমাদের সমাজে যে সংকট গুলো আছে, এই সময়টাতে আপনি কি করবেন? এ সংকট গুলোকে এভাবে রেখে দিবেন আপনি?

মনে করেন একটা জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে, ঝড়ের মধ্যে পড়েছে, ক্যাপ্টেন মারা গিয়েছে, কম্পাস হারিয়ে গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে জাহাজটা, সাথে নিচে একটা ফুটা হয়ে গিয়েছে, পানি উঠছে, এখন আপনি কি করবেন? আপনি কি গন্তব্যে যাওয়ার প্রতি ফোকাস করবেন? নাকি পানিটা বন্ধ করবেন? পানি বন্ধ করতে হবে আপনার, কোন কিছু করার নেই। তো গন্তব্যে পৌঁছানো, এটা তো অবশ্যই শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু আপনাকে এই কাজটা করতে হবে। এই কাজটা আপনি যদি না করেন তাহলে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন না। সুতরাং আমি যেটা বলছি তা হলো যে এই কাজটা করা গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক শক্তির মাধ্যমে কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

এখন একটা প্রশ্ন আপনি করতে পারেন যে, ঠিক আছে আপনি এগুলো বলছেন, কিন্তু এটার মাধ্যমে তো শরিয়া কায়েম হবে না, আপনি এটাই বললেন। তাহলে আমি এ কাজটা কেন করব? শরিয়াত কায়েম যেটায় হবে না আমি কেন করব?

এটার উত্তর হলো যে আপনি মসজিদ, মাদ্রাসায় টাকা কেন দেন? আপনি দাওয়াত ও তাবলীগ কেন করেন? আপনি ইসলাহী মজলিস কেন করেন? এগুলো দিয়েও তো ইসলাম কায়েম হবে না। হবে বলেন? দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম হবে? মসজিদ মাদ্রাসা বানানোর মাধ্যমে এটা হবে? তার মানে কি এই কাজগুলোর গুরুত্ব নেই? অবশ্যই আছে কাজগুলোর গুরুত্ব।

সুতরাং একইভাবে, যে কারণে গুরুত্ব থাকার কারণে, প্রয়োজন থাকার কারণে, ফজিলত থাকার কারণে, আমরা এ কাজগুলো করি। শরীয়ার তাকাজা থাকার কারণে আমরা এ কাজগুলো করি, একইভাবে এই কাজটাও আপনি করেন। এইটার মাধ্যমে হবে না তার মানে এটা নয় যে এ কাজের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

আমি যেটা বলছি সেটা হলো যে, আমাদের মারাত্মক ধরনের ক্রাইসিস আছে, এবং বর্তমানের অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের ক্রাইসিসগুলো আরো ঘনীভূত হবে। তো এই কারণে আমাদের এখানে যতগুলো দ্বীনি খেদমত চলছে, এগুলোর কোনটার সাথে কোন, শরিয়াস সম্মত কারো সাথে কোন বিরোধিতা নেই, এই সবগুলো কাজকে আমরা সমর্থন করি, এই সবগুলো কাজে আমাদের যুক্ত হতে হবে। কিন্তু আলাদাভাবে সামাজিক শক্তি অর্জনের যে কাজ, এই কাজটার প্রয়োজন আছে। এই কাজটার জন্য স্বতন্ত্র কিছু প্রয়োজনীয় কাজ দরকার। এই কাজটার জন্য স্বতন্ত্র কিছু উদ্যোগ দরকার। এতোটুকুই বলছি, এর বেশি কিছু না।

এবং এভাবে চিন্তা করেন যে, আমরা সবাই মুনাফার কথা চিন্তা করছি, শরিয়া কায়েমের যে ব্যাপারটা, এটা মুনাফার মতো, অবশ্যই এটার প্রয়োজন আছে, কিন্তু একটা নীতি আছে যে, মুনাফার আগে আপনার মূলধন রক্ষা করতে হয়। কিন্তু আপনার মূলধন তো হুমকির মুখে, আপনার মূলধন হলো ঈমান, সেটা হুমকির মুখে। সুতরাং মূলধন রক্ষার জন্য কাজ করা প্রয়োজন। এবং আমি বলছি যে বাংলাদেশের যে কোন ইসলামী কাজ, যেকোনো দ্বীনই কাজ আপনি যদি দীর্ঘ মেয়াদে ভালোভাবে করতে চান, এই সামাজিক শক্তিটা আপনার লাগবে। এখন আপনি যেকোনো কাজ করতে চান, কোন সমস্যা নেই, এগুলোর সাথে কোন দ্বিমত নেই, এগুলোর সাথে কোন বিরোধিতা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা শরীয়াহ সম্মত।

আপনি কাজগুলো করেন, এই কাজগুলোর জন্য আমরা দোয়া করি, এই কাজগুলোতে আমরা এক হবো, বাকি এখানে যে শূন্যতা আছে সেটা পূরণ করতে হবে।

এন্ডগেইম কী?

তারপরেও আপনার একটা কথা বলতে পারেন, ঠিক আছে ভাই এতকিছু করলাম, কিন্তু আল্টিমেটলি এটার এন্ড গেমটা কি? এটার এন্ড রেজাল্টটা কি? ঠিক আছে আপনি এই কাজ করে গেলেন, আপনি সামাজিক শক্তি অর্জন করলেন, তারপর কি?

শরিয়া যদি কায়েম না হয় তাহলে এটা এক সময় আবার অবনতির দিকে আসবে। তাই না? হ্যা। আসবে, এটা বাস্তবতা। যতদিন পর্যন্ত শরীয়া কায়েম না হবে, আমাদের সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান আসবে না। এটাই স্পষ্ট থাকা উচিত আমাদের সবার কাছে। এবং এটা ফরায়েজীদের ক্ষেত্রেও হয়েছে। ফরায়েজীদের ক্ষেত্রে আপনারা দেখেন যে, তারা সামাজিক শক্তি অর্জন করেছে, সামাজিক আন্দোলন বানিয়েছে, সমাজ পরিবর্তন করেছে, কিন্তু কোন একটা কারণে তারা তামকিন অর্জন করতে পারেনি। যে কারণে পরবর্তীতে আন্দোলনকৃত অবনতির দিকে গিয়েছে। আন্দোলন ওই জায়গাতে পরে আর আগাতে পারেনি। ডিক্লাইন হয়েছে।

এই সম্ভাবনা এখানেও আছে। আপনি সামাজিক শক্তি অর্জন করলেন কিন্তু আপনি শরিয়াহ কায়েম করলেন না, তাহলে এই সম্ভাবনা বা আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমি মনে করি সেই ক্ষেত্রেও এটা আপনার জন্য বেস্ট অপশন। এই কাজটা করা। কারন আপনার হাতে বিকল্প অপশন কি? আমরা এখন যে কাজগুলো করছি, এতোটুকুই যদি করি, নতুন কিছু অ্যাড না করি, তাহলে রেজাল্টটা কি? তাহলে রেজাল্টটা হল, অবস্থার অবনতি হবে।

আমি যেটা বলছি, যদি আপনি এটা করেন, আমি মনে করি, এটা আমার প্রস্তাবনা, আপনি দ্বিমত করতে পারেন, সেটা হলো আপনি এটলিস্ট একটা প্রজন্মের ক্ষেত্রে, আপনি এটলিস্ট এই অবনতিটা কিছুদিন দেরি করাতে পারবেন। এটা হল একটা সম্ভাবনা। আপনি মিনিংফুল কিছু সংস্কার আনতে পারবেন।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা:

তবে এখানে আরেকটা সম্ভাবনা আছে।

- প্রথম সম্ভাবনা হল – সামাজিক শক্তি অর্জন হল, তারপর আর আগাতে পারবে না। যেটা মাত্র বললাম। কিন্তু সেক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি কিছু মিনিংফুল সংস্কার নিয়ে আসবে। বর্তমান অবস্থার চেয়ে তুলনামূলক বেটার বা কম খারাপ হবে।

এটা প্রথম সম্ভাবনা। দ্বিতীয় সম্ভাবনা কী?

অন্য সম্ভাবনা হল **সামাজিক শক্তি, থেকে সামাজিক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন থেকে সমাজবিপ্লব আর তারপর যদি আল্লাহ চান, তাহলে পূর্ণাঙ্গ বৈপ্লবিক পরিবর্তন**।

এটা একটা সম্ভাব্য পাথওয়ে হতে পারে।

কিন্তু এটা সম্ভাবনা, নিশ্চয়তা নয়। এটা মাল্টি স্টেইজ প্রসেস।, ক্লাস ওয়ান থেকে কেউ ডিরেক্ট ক্লাস টেনে যাওয়া যায় না। আপনার প্রত্যেকটা ক্লাস আলাদা আলাদাভাবে পাশ করে করে উঠতে হয়। এই ব্যাপারটা এমন।

এটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, প্রচুর কাজের ব্যাপার আছে, এবং যেটা বললাম যে, বক্তা এবং ভক্তের বদলে এখানে সমাজকর্মী গড়ে তোলার ব্যাপার আছে। তাহলে হয়তো আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে পারব।

এখানে আমি সেই কথাটাই বলবো যেটা আমি আমার প্রথম পাবলিক স্পিচে বলেছিলাম, যদি আপনি সংস্কার চান, যদি আপনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন চান, দুটোর জন্যই আপনাকে সামাজিক শক্তি অর্জন করতে হবে। আপনি অর্থপূর্ণ সংস্কার চান অথবা আপনি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন, যেটাই আপনি চান দুটোর জন্যই এই কাজটা আপনাকে করতে হবে। পাশাপাশি আমি বলে দেই এটা অনেক দূরের একটা বিষয়। আপনি যদি ক্লাস ওয়ানে পড়েন, তাহলে আপনার পিএইচডির পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। আপনি যদি ইন্টার পাশ করেন, আপনি ইউনিভার্সিটি তে ভর্তি হয়েছেন, তখন আপনি হয়তো বা পিএইচডি নিয়ে পড়াশোনার চিন্তাভাবনা করবেন। বর্তমানে এটা উইশ ফুল থিংকিং আমার মতে।

আমাদের একটা ব্যাপার আছে সেটা হল, আমরা জাতিগতভাবে, জল্পনা কল্পনা করা একটু বেশি পছন্দ করি, আলাপ আলোচনায় একটু বেশি পছন্দ করি, আকাশ কুসুম কল্পনা করায় একটু বেশি পছন্দ করি, কিন্তু কাজ করতে পছন্দ করি না। সুতরাং এই জন্য আমি মনে করি এই প্রবণতা থেকে বের হয়ে এসে এখন আপনি কি করতে পারবেন, কিভাবে কাজ শুরু করতে পারবেন, এই জায়গাটাতে ফোকাস করা উচিত। আপাতত যেটা প্রাথমিক কাজ সেটার দিকে ফোকাস করা উচিত।

উপসংহার:

এই হল আমার প্রস্তাবনা। অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে, অনেক সন্দেহ আছে আমার কথাবার্তা নিয়ে– This is your answer, this is the proposal। এখানে সব কিছু স্পষ্ট স্পষ্ট, গোপন কোনো কিছু নেই, এখন দেখেন আপনারা যেটা ভালো মনে করেন।

আপনারা Disagree করতে পারেন, অবশ্যই Disagree করতে পারেন, এটা আমার মত। আপনি এখানে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, কোন প্রবলেম নেই। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখেন, আমাদের অল্টারনেটিভ দরকার। আমাদের বিকল্প দরকার। যেভাবে সবকিছু চলছে এভাবেই যদি চলে, আপনি একটা মহাসংকটের মধ্যে গিয়ে পড়বেন।

আপনার অবস্থা হল একটা ইঁদুরের মত যে একটা খাঁচার মধ্যে আছে, খাচাটা বড় হতে পারে, খাঁচাটার মধ্যে এসি দেওয়া হতে পারে, খাঁচার মধ্যে চমৎকার খাবারদাবার থাকতে পারে। খাচাটার আয়তন অনেক বেশি হতে পারে, কিন্তু তবুও সেটা একটা খাঁচা। আপনি এখানে নিয়ন্ত্রিত, আপনি এখানে নিয়ন্ত্রণ করেন না।

এটা হল বাস্তবতা। সুতরাং আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনি এই খাঁচা থেকে আপনি কিভাবে বের হবেন। আপনার অবস্থা হলো আপনি একটা বাড়ির মধ্যে আছেন, আপনার কাছে আলিশান বাড়ি মনে হতে পারে, কিন্তু বাড়ির ফাউন্ডেশন অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছে, যে কোন মুহূর্তে এটা ভেঙে পড়তে পারে। এবং এটা ক্ষয় হচ্ছে এটা ভাঙবে, এটা অনিবার্য ব্যাপার। সুতরাং এই বিষয়টা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে, এই বিষয়টা নিয়ে আপনাকে সলিউশন করতে হবে।